শিবের মতো বর চাইতে শেখানো হল কেন

জহর সরকার

ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী/চতুর্দশীর রাত্রি এ দেশের লক্ষ লক্ষ ভক্তের কাছে পরম পবিত্র। আসলে সারা বছরে শিবরাত্রির সংখ্যা বারো, কিন্তু ফাল্গুনের এই তিথিটিই সবচেয়ে পবিত্র বলে গণ্য হয়। অনেকে বলেন, এই দিনটিতেই শিব লিঙ্গরূপে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিলেন। পুরাণে আছে, এই দিন শিব ও পার্বতীয় বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী? বিয়ে তো কত লোকেই করে, এবং হরপার্বতীর বিয়েতে ঝঞ্ঝাট হয়েছিল বটে, কিন্তু অনেকের বিয়েতেই বিপুল ঝঞ্ঝাট হয়। এই দিনটার এমন অস্বাভাবিক মাহাত্ম্য কেন? বলা হয়, উত্তর গোলার্ধের আকাশে এই দিনটিতে গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান এমন হয়, যাতে মানুষ তার আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য শক্তি বিশেষ ভাবে জাগ্রত করে তুলতে পারে। শিব নিজে নাকি উমাকে বলেছিলেন, এই তিথি পালন করলে সমস্ত পাপের ফল থেকে নিষ্কৃতি মিলবে এবং মোক্ষলাভ হবে। অনেকের বিশ্বাস, শিবরাত্রিতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ইত্যাদি পাঠ করলে সত্যি সত্যিই শক্তি বাড়ে। এই লেখায় আমরা অবশ্য শিবরাত্রির আচার অনুষ্ঠান মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা বোঝার চেষ্টা করব, বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে শিবরাত্রি কেন এতটা মহিমা অর্জন করল?

আমার মতো গবেষকদের কাছে শিব আজও অতি আকর্ষণীয় এক দেবতা। বস্তুত, যে সব ইংরেজি-জানা শহুরে তরুণ ‘দেশি’ সংস্কৃতি এবং ধর্ম থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, তারাও এখন শিবের প্রবল অনুরাগী হয়েছে, অনেকটাই আমিশ ত্রিপাঠীর ‘শিব ট্রিলজি’র কল্যাণে। একটা ব্যাপার আমাকে চিরকালই বেশ অবাক করেছে: এই দেবতাটি পরনে একখানা বাঘছাল জড়িয়ে কী ভাবে হিমালয়ের ওই ঠান্ডা সামলান। আর, যে বাঙালি তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রির নীচে নামলেই তড়িঘড়ি মাফলার এবং মাঙ্কি ক্যাপ জড়িয়ে ফেলে, শিব তাদের এমন প্রিয় হন কী করে, সেটাও কম রহস্য নয়। শিবের মাহাত্ম্যের অন্য দিকও ভুললে চলে না। হিন্দুদের আদি ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রহ্মা সেই কোন কালে গুরুত্ব হারিয়েছেন, তাঁর জন্য সাকুল্যে পুষ্করে একটি মন্দির বরাদ্দ। বিষ্ণু দশাবতারের ছকটির কল্যাণে নিজের একটা ব্যবস্থা করেছেন। শিবের আসন কিন্তু খুবই পাকা। তিনি এমনকী দেবরাজ ইন্দ্রকেও হারিয়ে দিয়েছেন— বেচারি ইন্দ্র এখন নানান নামের শেষাংশ হয়ে টিকে আছেন, যেমন নরেন্দ্র। বস্তুত, শিবের সাম্রাজ্য ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে: তিব্বত তথা চিনের মানসরোবর থেকে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। দেশ জুড়ে বিস্তৃত তাঁর এক ডজন জ্যোতির্লিঙ্গ, কেদারনাথ থেকে সোমনাথ, বৈদ্যনাথ থেকে কাশী বিশ্বনাথ, দক্ষিণে রামেশ্বরম, আবার ও দিকে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্য নানা রাজ্যে তিনি পূজিত।

শিব বরুণ বা ইন্দ্রের মতো বৈদিক দেবতা নন বটে, কিন্তু শিবরাত্রি বহু যুগ ধরে পালিত হয়ে এসেছে। শিবের প্রাচীনতা প্রমাণ করার জন্য ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা চিত্রভানুর কথা বলা হয়, বলা হয় ঈশান সংহিতার কথাও। বিভিন্ন পুরাণের উল্লেখ তো আছেই: শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মত্স্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ ইত্যাদি। কিন্তু এগুলিতে সাধারণ ভাবে শিবের মাহাত্ম্যের কথা আছে, নির্দিষ্ট ভাবে শিবরাত্রির কথা নয়। এই প্রসঙ্গে জন মার্ডক-এর কথা বলা দরকার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন উত্সব সম্পর্কে উইলসন, ক্রুক, হিউজ এবং উইলকিনস যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, মার্ডক সেগুলি এক জায়গায় সংকলিত করেন। শিবরাত্রি সম্পর্কে ১৯০৪ সালে তিনি লিখেছিলেন, ‘প্রাচীন বলে কীর্তিত হলেও স্পষ্টতই এটি আসলে নিতান্ত অর্বাচীন।’ বস্তুত, অনেক দেবতাই প্রাচীন হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের উপাসনার পদ্ধতি হয়তো অনেক সাম্প্রতিক। যেমন আমাদের বারোয়ারি দুর্গোত্সব কিংবা মহারাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় গণেশ চতুর্থী, দুটিই মোটামুটি একশো বছরের পুরনো। তবে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে লেখা আব্বে দুবোয়ার প্রসিদ্ধ ‘হিন্দু ম্যানার্স, কাস্টমস অ্যান্ড সেরিমনিজ’ গ্রন্থে শিবরাত্রির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতে প্রাচীন শব্দটি বেশ ঠিলেঠালা ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত করে ধরে নিতে পারি যে, শিবরাত্রি অন্তত দুশো বছর পালিত হচ্ছে, এবং বিভিন্ন উত্সবের সঙ্গে তুলনা করলে দুশো বছর খুব কম সময় নয়।

কয়েকটি কল্পদ্রুম এবং তিথিতত্ত্বেও শিবরাত্রির আচার লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের কিছু কিছু তো দৃশ্যত তান্ত্রিক ধারার। শিবরাত্রির বয়স বিচার করতে গেলে একটা কথা মনে রাখতে হবে: বাংলায় শিবের যে রূপ,

সেটি কৈলাস-অধিপতির নয়, লোকসমাজে জনপ্রিয় শিবায়নে যে দরিদ্র কৃষিজীবী শিবের কথা আছে, এখানে তিনিই পূজিত হয়েছেন। তাঁর নেয়াপাতি ভুঁড়ি, তিনি নিজের গণ অর্থাৎ অনুচরদের সঙ্গে গাঁজা খান, ক্রুদ্ধ পার্বতী ঝাঁটা হাতে তাঁর পিছনে তাড়া করেন। আমরা স্মরণ করতে পারি শিবরাত্রির একটি আদি কাহিনি: এক শিকারি রাত্রিবেলায় বেল গাছে উঠে পড়েছিল এবং সেখানেই কাটিয়েছিল। গাছের নীচে ছিল এক শিবলিঙ্গ, শিকারির নড়াচড়ায় সারা রাত সেই শিবলিঙ্গটির উপর বেলপাতা পড়ল। সেটা ছিল শিবরাত্রি। সে যখন মারা গেল, যমদূত তাকে নিয়ে যেতে এল। কিন্তু শিবরাত্রিতে শিবলঙ্গে বেলপাতা চড়িয়েছিল সে, অতএব অশেষ পুণ্য হয়েছে তার, তাই শিবের অনুচররা যমদূতদের সঙ্গে লড়াই করে তাকে স্বর্গে শিবের কাছে নিয়ে গেল। কালকেতুর গল্পও স্মরণীয়— শিকারি কালকেতু অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্য পত্তন করল, যেখানে শিকার নয়, চাষবাসই হবে মানুষের প্রধান জীবিকা।

সোজা কথাটা এই যে, পনেরো থেকে সতেরো শতকের মধ্যে বাংলার মানুষ পৌরাণিক দেবদেবীদের নিজের করে নিচ্ছিল। সেই সময় শিকার, ফলমূল সংগ্রহ, মাছ ধরা এবং গরু-মোষ চরানোর পুরনো জীবিকা থেকে এই অঞ্চলের মানুষ উত্তরোত্তর কৃষিজীবী হয়ে উঠছে, জীবন ও জীবিকার সেই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেবলোকেও পরিবর্তন ঘটছে। কৈলাসের শিব কিংবা এমনকী দুর্গাও কী ভাবে চণ্ডী, ধর্ম এবং মনসার মতো দরিদ্রের দেবদেবীদের কাছে হেরে গেলেন, মঙ্গলকাব্যগুলি তো তারই কাহিনি। সমাজের নীচের তলা থেকে উঠে আসা চাষিদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে কৃষিজীবী শিবের একটুও সময় লাগেনি। দেবপূজার এই ‘গণতন্ত্রীকরণ’ বাংলাকে অন্য প্রদেশ থেকে আলাদা করেছে।

তবে শেষ করার আগে একটা কথা বলা দরকার। পুরাণে বা অন্যান্য প্রাচীন কাহিনিতে শিবরাত্রি প্রধানত পুরুষ ভক্তদের ব্যাপার বলেই দেখানো হয়েছে। তা হলে মেয়েদের মধ্যে তা এমন গুরুত্ব অর্জন করল কী করে? আমার ধারণা, মুঘল আমলের শেষের দিকে এবং ব্রিটিশ যুগের প্রথম পর্বে হিন্দু জমিদার ও ‘রাজা’দের প্রতিপত্তি যখন বাড়ল, তখন সমাজে পিতৃতন্ত্র নানা ভাবে, নানা রূপে নতুন করে আধিপত্য জারি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। এমনকী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকেও করে বাগে আনা হল— স্বাধীনচেতা শৌর্যময়ী দেবীকে বাৎসল্যে সিক্ত করে ঘরের মেয়ে বানিয়ে ফেলা হল, যে মেয়ে বৎসরান্তে বাপের বাড়ি আসে, চার দিন সেখানে কাটিয়ে আবার কেঁদে এবং কাঁদিয়ে পতিগৃহে যাত্রা করে। এই প্রক্রিয়াতেই শিবের ভাবমূর্তি এবং উপাসনারও একটা রূপান্তর ঘটে গেল। তাঁর শক্তিমতী স্ত্রীকে পাতিব্রত্যের লাগাম পরিয়ে বেঁধে ফেলা হল, আর অল্পবয়সি মেয়েদের তাঁর আরাধনায় উপবাস ও অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত পালনে নিযুক্ত করা হল, যাতে তারা শিবের মতো প্রবল এবং রগচটা এক স্বামীকে মনে মনে কামনা করে। তবে এ সব বিচার বিশ্লেষণের পরেও একটা কথা মানতেই হয়: বাংলার সমাজে শিবের মহিমা এখনও বিপুল, ভক্তরা লাখে লাখে দেবাদিদেবের আরাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। বাংলার আকাশবাতাস মথিত করে আজও প্রবল আওয়াজ ওঠে: ভোলে বোম তারক বোম।

প্রসার ভারতীর কর্ণধার। মতামত ব্যক্তিগত